দুপুর ০৩:২৫ (২৯/১১)

ঘোষণা পত্র
বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি

১৯৪৭ সালে তৎকালীন বৃটিশ-ভারত দ্বি-খ"িত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামক দু'টি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সমসাময়িক রাজনীতিবিদগণের দৃষ্টিতে এবং সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি অপরিহার্য ছিল বলেই অনুভূত। স্বাধীন পাকিস্তানের স্বাধীনতাত্তোর বা সমসাময়িক নেতৃত্বের দায়িত্ব ছিল পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রকে সৎভাবে, গণতান্ত্রিকভাবে ও গঠনমূলকভাবে পরিচালনা করা। ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, এ কাজটি ঐ প্রজন্মের রাজনীতিবিদগণ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসকগণ সঠিকভাবে করতে পারেন নি। ফলশ্র"তিতে তৎকালীন পাকিস্তানের পূর্ব অংশ তথা পূর্ব পাকিস্তান বিবিধ আঙ্গিকে বঞ্চিত হতে থাকে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় জননেতাগণের অধিকাংশই পাকিস্তান সরকার ও রাজনীতিবিদগণের এই অন্যায় ও বঞ্চনার বির"দ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। ন্যায় বিচারের অভাবে, সাম্যভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে এবং গঠনমূলক পরিবেশের অভাবে তৎকালীন পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠী যারা নৃ-তাত্তিকভাবে বাঙালি এবং ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদে বাঙালি তারা প্রথমত স্বাধীকার আন্দোলন এবং পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার আন্দোলন সূচনা করতে বাধ্য হন। সমসাময়িক ছাত্র নেতাগণ এবং কৃষক, শ্রমিক, পেশাজীবী ও রাজনৈতিক নেতাগণ দেশবাসীকে নেতৃত্ব দেন।

১৯৪৭ সাল থেকে একাধিক আঙ্গিকে মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এবং তাদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্যের কনিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতাগণ পূর্ব বাংলার জনগণের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধন করেন, জাতিকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন এবং জাতিকে স্বাধীকার বা স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ ও সংঘটিত করেন। মওলানা ভাসানী এবং বঙ্গবন্ধু একাধিকবার একাধিক প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা, প্রেরণা দান করা এবং স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের জন্য একতাবদ্ধ ও প্রস্তুত করার কাজে নেতৃত্ব দান করেন। ইতিহাস স্বাক্ষী দেয় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেছেন। গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের বেঁচে থাকার শেষ আশাটিকেও তৎকালীন পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক নিঃশেষ করা হয় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত মধ্যরাতে। ফলে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ শুর" করা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখের পূর্বে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার মানুষ স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত ছিল। ২৬ মার্চ তারিখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুর" হয়। এ সময় চট্টগ্রাম মহানগরে অবস্থিত তৎকালীন রেডিও পাকিস্তানের কালুরঘাট কেন্দ্র থেকে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমান স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পরামর্শে এবং নিজ বিবেচনায় প্রথমত নিজ নামে পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতা যুদ্ধের তথা মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দেন। ২৬ থেকে ৩০ মার্চ সময়কালের মধ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত বেঙ্গল রেজিমেন্টের সকল ব্যাটালিয়ন, তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এ কর্মরত বেশিরভাগ বাঙালি সদস্য, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান পুলিশে কর্মরত বহু সংখ্যক সদস্য পাকিস্তানের বির"দ্ধে বিদ্রোহ করে ও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। কালক্রমে দেশের সকল অঞ্চলের হাজার হাজার ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, সাবেক পুলিশ ও সৈনিক এবং রাজনৈতিক কর্মী মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়।

বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকতা সহকারে মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেন এবং মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সেই সরকারের পাশে থেকে প্রধান উপদেষ্টার পরিচয়ে আদর্শ বয়োজ্যেষ্ঠ নেতার ভূমিকা পালন করেন। একইসাথে দেশব্যাপী-বিস্তৃত রণাঙ্গণে প্রধান সেনাপতি (তৎকালীন কর্নেল ও পরবর্তীতে) জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানীর পরিচালনায় সেক্টর কমান্ডারগণের অধিনায়কত্বে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাগণ দখলদার বাহিনী এবং তাদের এ দেশীয় সহযোগিদের বির"দ্ধে যুদ্ধরত থাকেন। আবাল বৃদ্ধ-বণিতা, পুর"ষ ও মহিলা, ভাই ও বোনেরা সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাগণকে বহুমুখী সহায়তা ও সাহায্য দিয়ে অনুপ্রাণিত ও সচল রাখেন।

যতকিছুই বলা হোক না কেন, বাস্তবতা হল এই যে, তৎকালীন পূর্ব বাংলার কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করে। বিরোধীতা করার কারণ হিসেবে তারা একাধিক রাজনৈতিক তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিল এবং দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তারা শান্তির ধর্ম দ্বীন-ইসলামকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছিল। রাজনৈতিক অজুহাত এবং ধর্মীয় অজুহাত এই উভয় অজুহাতের মিলিত বক্তব্য ছিল অনেকটা এরকম: "পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র, পাকিস্তান মুসলমানদের রাষ্ট্র; ইসলাম এবং মুসলমানদের স্বার্থেই পাকিস্তানকে রক্ষা করা প্রয়োজন; পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হলে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিরোধীতা করতেই হবে; অতিরিক্ত কারণ হল, মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ভারত সাহায্য করছে এবং ভারত পাকিস্তানের শত্র" বিধায় পাকিস্তানকে ধবংস করতে লিপ্ত তাই যে কোনো মূল্যে পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে।" এইরূপ অজুহাত ধারণকারী সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দখলদার বাহিনীকে সহযোগিতা করে। সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের নেতা ও কর্মীগণের সহায়তায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান শাসনকারী সামরিক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রকারের আধা সামরিক বাহিনী সৃষ্টি করে। এই সকল আধা সামরিক বাহিনী দখলদার বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুদ্ধের সংজ্ঞার বাইরেও বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত থাকে। সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলের নিজস্ব চিন্তাধারায়, পরিকল্পনায় ও অংশগ্রহণে বিভিন্ন প্রকারের বেসরকারি অস্ত্রধারী বাহিনীও সৃষ্টি করা হয়েছিল যেগুলো মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতাকারী জনগণের বির"দ্ধে এমন এমন কর্মকা" ও অপরাধে লিপ্ত হয় যার অনেকগুলোকে যুদ্ধ-অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করা যায়। সারমর্মে এই বলতে হবে যে, তৎকালীন দখলদার বাহিনীর অনুকূলে এইরূপ কর্মকা" লিপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা অল্প হলেও দৃষ্টিগোচর ছিল। মুসলমান নামধারী মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী এই সকল ব্যক্তিদের এই সকল কর্মকা"র মাধ্যমে সাধারণ ধর্মপ্রাণ ইসলামী নেতৃত্বকে একটি অপমানজনক ও বিতর্কিত অবস্থায় দাঁড় করানো হয়। তথা, এমন একটি ছবি জনগণের মানসপটে স্থির করা হয় যে, দ্বীন-ইসলাম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী।

যাহোক, ৯ মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর, ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে, লক্ষ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে, লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীর অঙ্গহানী বা শারিরীক ক্ষতি ও বস্তুগত ক্ষতির বিনিময়ে, যুদ্ধের শেষাংশে মিত্রবাহিনীর সীমিত সহায়তায় এবং চূড়ান্ত ও সার্বিকভাবে মহান সৃষ্টিকর্তা আল- াহতায়ালার অপার দয়ায় আমরা বিজয় অর্জন করি। বিজয়ের জন্য আলণ্ডাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বিজয় সম্পর্কিত অত্যন্ত সুক্ষ্ম একটি বিষয় সাধারণভাবে বাংলাদেশের মানুষের দৃষ্টির বা চিন্তার অগোচরে থেকে গিয়েছে। সেটি হল যে, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখ কারা আত্মসমর্পন করেছিল, কারা আত্মসমর্পন গ্রহণ করেছিল, এবং কারা আত্মসমর্পন করেনি? আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পন করেছিল তৎকালীন পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড বা ইস্টার্ন কমান্ডের অধীনে পাকিস্তানের হয়ে যুদ্ধরত কম-বেশি তিরানব্বই হাজার সামরিক অফিসার ও সৈনিক। একইসাথে দেশের বিভিন্ন জায়গায় অনানুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পন করেছিল বাংলাভাষী কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বিভিন্ন অস্ত্রধারী সংগঠনের কিছু কিছু সদস্য। আত্মসমর্পন গ্রহণ

করেছিল ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ সংগঠন (যার নাম ছিল মিত্র বাহিনী) এর পক্ষে তার অধিনায়ক তথা ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডের অধিনায়ক, মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে। কিন্তু কোথাও কারো নিকট আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পন করেনি ঐ সকল রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ যারা মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক বিরোধীতা করেছিল। এতদকিছুকে মেনে নিয়েই ১৬ ডিসেম্বর আমাদের মহান বিজয় দিবস।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখ অপরাহ্ন থেকে, মুক্ত বাংলাদেশ যাত্রা শুর“ করে। সেই তারিখ থেকে ১৯৭৫ এর ১৪ আগস্ট পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বকারী রাজনৈতিক দলটিই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে ছিল। অতঃপর বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে দেশ ও সমাজ ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসের ১১ তারিখ পর্যন্ত আসে। বাংলাদশের এই নাতিদীর্ঘ জীবনে সকল ঘটনাই সুখকর নয়, সকল ঘটনাই অপ্রীতিকর নয়। তবে যেই ঘটনা বা ঘটনাপ্রবাহ সবচেয়ে বেশি জনগণের মানসপটে রেখাপাত করেছে সেটি হল ক্রমান্বয়ে দুর্নীতির বহুল প্রসার, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ও ব্যবসায়ীকরণ, প্রশাসনে দলীয়করণ ও সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা, রাজনৈতিক ন্যূনতম মতৈক্যের অভাব, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে জনকল্যাণ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতনার অভাব এবং যে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সেই জনগণের প্রতি পর্যাপ্ত জবাবদিহিতার অভাব। এই সকল এবং অন্যান্য বিবিধ কারণে অতীতে সরকার পরিচালনাকারী কিছুসংখ্যক নেতৃবর্গ অর্থনৈতিক আন্তর্জাতিক আধিপত্যবাদ এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক লোভ-লালসার নিকট আত্মসমর্পন করেন। এইরূপ আত্মসমর্পনের কারণে দেশের বৃহত্তর স্বার্থগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হতে থাকে। রাজনৈতিক পরিম™লে ধৈর্য্যের অভাব, সংঘর্ষ প্রবণতা এবং যে কোনো প্রকারেই ক্ষমতা-আরোহন এর প্রবণতা বিগত দিনগুলোর রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রচুর আনুষ্ঠানিক জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও অতীতের সরকারগুলো ফলপ্রসু পদক্ষেপ বিশদভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। ফলশ্র“তিতে শুধু গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিই বাধাগ্রস্থ হয়নি, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রাষ্ট্রীয় ভাবমূর্তিও মারাত্মকভাব ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে অকার্যকর করে ফেলার কিছু কিছু লক্ষণ সচেতন দেশপ্রেমিক জনগণের নিকট উদ্ভাসিত হয়। এই প্রেক্ষাপটেই বাংলাদেশের আপামর জনগণের মানসিক আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে ঘটিয়ে, বাংলাদেশকে কার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে বাঁচিয়ে রাখার দৃঢ় প্রত্যয়ে সংঘটিত হয় ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসের ১১ তারিখের ঘটনা। এইদিন সন্ধ্যা থেকে বাংলাদেশের সংবিধানের অধীনেই একটি পরিবর্তনশীল ও পরিবর্তনকামী আবহাওয়ায় বাংলাদেশ প্রশাসিত ও পরিচালিত হচ্ছে।

৩৬ বছরের স্বাধীন বাংলাদেশের সুখের ও দুঃখের চেতনাকে লালন করে, বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণ পৃথিবীর বুকে একটি নতুন অগ্রযাত্রার সূচনা করতে চায়। এই অগ্রযাত্রায় একদিকে প্রবীণদের ইতিবাচক অভিজ্ঞতা এবং দোয়া বা আশীর্বাদ এবং অপরদিকে নবীনদের আধুনিক মানসিকতা ও উদ্যম-এর সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে। এই প্রেক্ষাপটেই আজ ৪ ডিসেম্বর ২০০৭ সালের এ আয়োজন। আজকের এ রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের মধ্যে বহুসংখ্যক ব্যক্তিই ১৯৭১ সালের রণাঙ্গণের মুক্তিযোদ্ধা এবং বিগত ৩৬ বছরের ঘটনাপ্রবাহের স্বাক্ষী। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে, সাবেক সেনা সদস্য হিসেবে এবং সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমরা দেশপ্রেমিক জনগণ এবং দেশপ্রেমিক সামরিক বাহিনীকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাই।

উলেণ্যখ্য যে, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ শুধুমাত্র ১৯৭১ এর একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, তাই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে আমলে নেওয়া আমরা কর্তব্য মনে করি। আজকের এ ঐতিহাসিক দিনে আমরা শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ বিগত দিনের রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি সম্মান জানাচ্ছি। আমরা বিশেষভাবে সম্মান জানাচ্ছি বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি ও রূপকার শহীদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর প্রতি। আমরা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজর™ল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী

তাজউদ্দিন আহমদসহ সকল সদস্যের প্রতি সম্মান জানাচ্ছি। আমরা ১৯৫২ সালের ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মান জানাচ্ছি, ১৯৬৯ এর গণআন্দোলনকালে শহীদদের প্রতি সম্মান জানাচ্ছি এবং সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানাচ্ছি। আমরা অবশ্যই সকল জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিও সম্মান জানাচ্ছি। পৃথিবীব্যাপী যুগে যুগে অন্যায় ও অত্যাচারের বির"দ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে বা ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যারা প্রাণ দিয়েছেন তাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাচ্ছি। সাধারণ জনগণ যারা বিবিধ প্রকারের প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে, বিশেষত ২০০৭ সালের নভেম্বরের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' এর আক্রমনে অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাচ্ছি।

বিগত ৩৬ বছরের বাংলাদেশে প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে, প্রচুর ভালো কাজও হয়েছে। অতীতের সকল সরকারকে সকল ভালো ও গঠনমূলক কাজের জন্য আমরা অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাদের গঠনমূলক অভিজ্ঞতা আমরা কাজে লাগাবার অঙ্গিকার করছি। বহু লোকের সঙ্গে আমরাও বলতে চাই যে, আরও ভালো কাজ হতে পারতো, দেশে অধিকতর অগ্রগতি হতে পারতো, সুনিশ্চিত কিছু কারণের জন্যই এগুলো হয় নি। অন্য সকলের সঙ্গে আমরাও মনে করি যে আমরা যদি সে কারণগুলোকে চিহ্নিত করতে পারি এবং নতুনভাবে সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই বাংলাদেশ দ্র"ত অগ্রগতি অর্জন করবে। পৃথিবীর বুকে অধিকতর সম্মানজনক জায়গায় অবস্থান নিবে। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক আধিপত্যবাদের রাহুগ্রাস বা সম্প্রসারণবাদের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত থেকে আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে নিজের অবস্থান সৃষ্টি করে নিতে পারবে। এই কারণগুলো চিহ্নিত করা এবং নতুনভাবে সম্মিলিত উদ্যোগ নেয়ার প্রক্রিয়াটিকে এগিয়ে নেয়ার অনুঘটকের দায়িত্ব রাজনীতিবিদগণ তথা রাজনৈতিক দলকেই করতে হবে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের বিদ্যামান রাজনৈতিক দলগুলোর চেষ্টার পরিপূরক নতুন চেষ্টা ও উদ্যোগকে জনগণ স্বাগত জানাতে চায়।

এই প্রেক্ষাপটেই আজকের তারিখে এই স্থানে আমরা 'বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দলের ঘোষণা দিচ্ছি। মহান সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আলণ্ডাহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন অবিচল রেখে, একই দয়াময়, কর"ণাময়, সমগ্র সৃষ্টিজগতের লালন-পালনকারী আল- াহতায়ালার দয়া কামনা করতঃ আমরা যাত্রা শুর" করছি। আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, সৃষ্টির সেবার মাধ্যমে স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় এবং রাজনীতিকেও সৃষ্টির সেবা বা জনগণের সেবার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা যায়। আমরা রাজনীতিকে বাংলাদেশের জনগণের সেবার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার অঙ্গিকার করছি। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায় বিচারভিত্তিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও মানবতাবাদী তথা পালনবাদী চেতনার উন্মেষ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলিত হোক, এটাই আমাদের বীর জনগণ দেখতে চান। জাতীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব এবং আমাদের তাহজীব-তমুদ্দুন-সংস্কৃতি বিরোধী তৎপরতার বির"দ্ধে প্রতিরোধের লক্ষে নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। জাতীয় জীবনের এই যুগ সন্ধিক্ষণে (২০০৭ খৃস্টাব্দ) সচেতন জনগণের দাবী অত্যন্ত সুস্পষ্ট: জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সুদৃঢ় গণঐক্য ও জনগণের জন্য অর্থবহ গণতন্ত্র গড়ে তুলতে হবে। ঐক্যবদ্ধ ও পুনর"জ্জীবিত জাতিকে স্বনির্ভর অর্থনীতির মাধ্যমে আধিপত্যবাদের বিভীষিকা থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা দিতে হবে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা তথা মৌলিক ও মানবিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য যুগোপযোগী রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই সকল দেশপ্রেমিক জনগণকে অটল, অবিচল ও ঐক্যবদ্ধ কাতারে শামিল করে জাতীয় পর্যায়ে স্থিতিশীলতা এবং সার্বিক উন্নতি অগ্রগতি ও প্রগতি আনার লক্ষে বৈপণ্ডবিক উদারতা ও বিশালতা নিয়ে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা সময়ের দাবী। এই প্রেক্ষাপটেই বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির ঘোষণাপত্র ঘোষণা করছি।

আমাদের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য হবে ঃ (১) সমঝোতার রাজনীতি (২) সমন্বয়ের রাজনীতি, (৩) সহযোগিতার রাজনীতি। যে সকল বিষয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে দূরত্বের অবস্থানে নিয়ে গিয়েছে সে সকল বিষয়কে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে কমিয়ে আনতে হবে। যেখানে সম্ভব কিছু দেওয়া ও কিছু নেওয়া এই নীতির মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। যে কোনো ভালো কাজের জন্য রাজনৈতিক অঙ্গনে পারস্পরিক সহযোগিতা করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, ভালো কাজের কোনো একচ্ছত্র মালিকানা নেই। যে কোনো ভালো কাজ প্রশংসা ও সহযোগিতা পাওয়ার দাবী রাখে। বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রাসঙ্গিক আইনের অধীনে যত প্রকারের রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি রাজনীতি কর"ন না কেন, আমরা সকলের সঙ্গেই সমঝোতা, সমন্বয় ও সহযোগিতা করতে প্রস্তুত একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। ব্যতিক্রমটি হচ্ছে এই যে, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যে সকল ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেছিলেন বা বিরোধীতা করতে গিয়ে যুদ্ধাপরাধতূল্য বিবিধ অপরাধ করেছিলেন, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গে আমরা কোনোপ্রকার সমঝোতা বা সমন্বয় বা সহযোগিতা করব না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আইনানুগ প্রক্রিয়ায় ঐ বিরোধীতা ও অপরাধগুলোর নিষ্পত্তি হয়। আমরা সকল অপরাধের বিচার প্রার্থনা করি।

ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের জনগণ উপমহাদেশের অন্যান্য জাতি সত্তা থেকে পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। অভিন্ন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, ভৌগলিক অবস্থান, ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং সাধারণ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিত্তিমূল দৃঢ় করেছে। সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদের ক্ষয়িষ্ণু অংশের বির"দ্ধে অবিরাম সংগ্রাম এই চেতনাকে বলিষ্ঠ করেছে। ১৯৭১ এর ঐতিহাসিক স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ ধর্ম, গোত্র, অঞ্চল নির্বিশেষে বাংলাদেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করেছে। মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এই জাতি স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। ধর্ম বিশ্বাস এবং ধর্মপালন বাংলাদেশের জনগণের চিরঞ্জীব বৈশিষ্ট্য। নিষ্ঠুর বিদেশি ও বিজাতীয় শোষণ-নির্যাতনের বির"দ্ধে সুদীর্ঘকালের গণসংগ্রাম বাংলাদেশের সমাজ জীবনকে উদার ধর্মবোধে স্থিতিশীল ও মহত্বর করেছে। বাংলাদেশের জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শে বিশ্বাসী। ইসলাম মানবতার ধর্ম। ইসলাম ধর্মের মহান শিক্ষা সকল সম্প্রদায়কে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ছোবল থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ, অন্যান্য ধর্মের মূল্যবোধ ও আদর্শে বিশ্বাসী। তাদের নিজস্ব ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আদর্শের চেতনা প্রস্ফুটিত করার অবারিত করার সুযোগ অলংঘনীয় অধিকার। এই প্রেক্ষাপটে ইসলামসহ অন্যান্য সকল ধর্মের অনুসারীগণ যুগ যুগ ধরে সম্প্রীতির পরিবেশে বসবাস করে আসছেন। এ কারণেই ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল নাগরিক জাতীয় স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি অর্জনের সংগ্রামে শরীক হয়ে মহান জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক ইস্পাতকঠিন জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এই ঐক্যকে বৃহত্তররূপ দান করে জাতীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে সুরক্ষিত করাই দলের অন্যতম লক্ষ্য।

পূর্বেও উলেণ্টখ করা হয়েছে যে, বিগত ৩৬ বৎসর যাবত সেই সকল রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আর্থ-সামাজিক বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে বিভক্তি বা মত পার্থক্য ছিল সেই সকল মত পার্থক্য কমিয়ে ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। এর জন্য ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যুদ্ধাপরাধীগণ ব্যতীত সকল বাংলাদেশী নাগরিককে জাতীয় সমঝোতার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটেই একাধিক ঐতিহাসিক নেতৃত্ব আমাদের ইতিহাসে ও মানসপটে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ঐতিহাসিক জাতীয় নেতাগণকে আমরা নিজেদের মধ্যে বিভক্তির অজুহাত বানিয়েছি। তাই সেই বিভক্তির অবসান প্রয়োজন। জাতীয় নেতাগণকে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন, বিভক্তির প্রতীক হিসেবে নয়। তাই আমরা যুগপদ বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি ও রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও

মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রমুখ জাতীয় নেতাদের সম্মান জানাচ্ছি। তারা আমাদের প্রেরণার ও দিক নির্দেশনার উৎস।

আমারা যারা রাজনৈতিক কর্মকা- পরিচালনা করবো তাদের আচরণের তিনটি বৈশিষ্ট্য হবে যে, আমরা (১) সাহসের সঙ্গে রাজনীতি করবো (২) সততার সঙ্গে রাজনীতি করবো এবং (৩) দক্ষতার সঙ্গে রাজনীতি করবো। রাজনীতি করতে গিয়ে জনগণের নিকট বা বিদ্যমান সরকারের নিকট বা সহযোগী রাজনৈতিক দলগুলোর নিকট বাস্তবতা তুলে ধরার প্রয়োজন সর্বদাই থাকবে। এ কাজ করতে গিয়ে আমরা সাহস এবং সততা অবলম্বন করতে চাই। যে কোনো কাজ দক্ষতার সঙ্গে করতে না পারলে তার পুরোপুরি উপকারিতা পাওয়া যায় না। দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সম্পর্ক আছে। দক্ষতার সঙ্গে সততার যোগসূত্র হলে বহুমাত্রায় বেশি উপকারিতা পাওয়া যায়। অপরপক্ষে, অসততার প্রভাবে দক্ষ ব্যক্তিগণ বিপথগামী হয়ে জনগণের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠেন। রাজনীতিবিদগণের অন্যতম লক্ষ্য বা পরিণতি যেহেতু রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনা করা সেহেতু রাজনীতিবিদগণের জন্য দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য এবং বিকল্পবিহীন।

এই দলের রাজনীতির **মূলনীতি** বা লক্ষ্যবস্তু হবে (১) জাতীয়তাবাদ বা জাতীয়তাবাদী চেতনাকে শক্তিশালী করা যাতে করে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, ভৌগলিক অখ-তা এবং চেতনার স্বাধীনতা অবিরত থাকে। (২) গণতন্ত্র তথা রাজনৈতিক প্রশাসনের সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক চর্চা শক্তিশালী করা যাতে করে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, ভৌগলিক অখ-তা রক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা ইত্যাদি কর্মে সর্বাধিক ব্যক্তি, সর্বাধিক অবদান রাখতে পারেন। (৩) রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। কারণ, শক্তিশালী অর্থনীতি ব্যতীত রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, অখ-তা ও স্বাধীনতা রক্ষার উপাত্তগুলোকে বা জনগণের কল্যাণের উপাত্তগুলোকে শক্তিশালী করা যাবে না। তবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানে কোনো অবস্থাতেই এক বা একাধিক শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের উন্নয়ন নয়। (৪) বাংলাদেশে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। সংক্ষিপ্ত বিবরণে কল্যাণ রাষ্ট্র বলতে এই বুঝাতে চাই যে, পাঁচটি মৌলিক অধিকার বা চাহিদা যথা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা সকল জনগণের নিকট প্রাপ্য করতে হবে। যে সকল জনগণ নিজ উদ্যোগে এই অধিকারগুলো ভোগ করতে পারবেন তাদেরকে বাধাহীনভাবে ভোগ করতে দিতে হবে এই শর্তে যে, তারা অন্যের অধিকার হরণ করছেন না। অপরপক্ষে যে সকল জনগণ নিজ উদ্যোগে এই অধিকারগুলো ভোগ করার সুযোগ পাবেন না বা যোগ্যতা নেই তাদের নিকট সেই সুযোগটি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্য করতে হবে। কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা দীর্ঘমেয়াদী কাজ বিধায় লক্ষ্যস্থির করে কাজ শুর- করে দেয়াটাই শ্রেয়। (৫) মানবতাবাদ তথা মানুষকে ভালোবাসার বা মানুষের সেবা করার বা মানুষের উপকার করার মাধ্যমে স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে।

জনকল্যাণের জন্য অর্থবহ গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের রাজনীতি : জনকল্যাণমূখী রাজনীতির জন্য প্রয়োজন জাতীয় ঐক্যের এবং ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার। দু'শতাব্দীর দুঃশাসন, শোষণ ও নিষ্পেসণের ফলে বাংলাদেশের জনজীবনে দারিদ্র, অশিক্ষা ও অপুষ্টি নিষ্ঠুর অভিশাপের মত বিরাজমান। আমাদের জনগণের নব্বই ভাগের বেশি মানুষ গ্রামে দারিদ্র সীমার নীচে আধুনিক সভ্যতার সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত অবস্থায় দিনযাপন করেন। প্রায় ষাট শতাংশ মানুষ নিরক্ষরতা, অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতাকে নিয়েই নিত্য দিন বেঁচে থাকে। বেকারত্ব ও কর্মহীনতায় প্রায় ৪ কোটি মানুষ অভিশপ্ত জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। জনসংখ্যার অর্ধেক নারী তথা নারী সমাজ জাতীয় উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আশানুরূপ ভূমিকা পালন করতে পারছেনা বা তাদের ভূমিকা পালন করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। উন্নয়ন ও উৎপাদনের রাজনীতিকে সামাজিক ন্যায় বিচার ভিত্তিক জনকল্যাণমূখী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনের জাতীয় প্রচেষ্টার সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে নারী সমাজকে সংশিণ্টষ্ট করতে হবে। জাতীয় জীবনে ইতিবাচক রাজনীতির চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। গ্রামমূখী ও গণমুখী রাজনীতিকে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের বিধ্বংসী কব্জা থেকে মুক্ত রাখার সর্বাত্মক

প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। যোগ্য, দক্ষ ও আত্ম-নিবেদিত নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। তবেই জনগণ ন্যায় বিচারভিত্তিক সুষম অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারবে। বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে এমন এক বাস্তব নির্ভর ও গণমূখী কাঠামো ও ব্যবস্থা গড়ে তোলা যার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ নিজ নিজ ক্ষেত্রে সকল রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে এবং সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করে জাতীয়ভাবে, সামাজিকভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনতে পারেন। জাতীয় জীবনে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক জীবনে আত্মনির্ভরশীলতা অপরিহার্য। সচেতন ও সংগঠিত জনগণই সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। গ্রাম ও শহরের মানুষকে সচেতনভাবে সুসংগঠিত করা এবং উন্নয়মূখী পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করা ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা দেওয়া: এসবই জনগণের জন্য অর্থবহ গণতন্ত্রের অপরিহার্য উপাদান। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পার্টির সার্বিক সাংগঠনিক কাঠামো এবং আন্তরিক প্রচেষ্টাকে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত রাখবে। বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব আঞ্চলিক অখন্ডতাকে অটুট রাখার জন্য স্থিতিশীলতা, শান্তি ও নিরংকুশ নিরাপত্তা সময়ের দাবী। জাতীয় জীবনে স্থিতিশীলতার শত্রু সন্ত্রাসবাদ, রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা বিধান করা এবং অগণতান্ত্রিক রাজনীতিকে নিরুৎসাহিত করতে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে।

অন্যান্য বক্তব্য:

১। সামাজিক অন্যায় ও বৈষম্য প্রসংগে : সামাজিক অন্যায় ও বৈষম্যের অবসানের লক্ষ্যে ঔপনিবেশিক ও আধিপত্যবাদী সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের অবসান ঘটাতে হবে। ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য সৎ, ত্যাগী, দেশপ্রেমিক দূরদর্শী রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও দায়িত্বশীল জবাবদিহিমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। প্রচলিত রাজনীতি ও প্রশাসন দুর্নীতির সেবাদাসে পরিণত হয়ে লুটেরা ধনীক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। এ অবস্থার পরিবর্তন করে সামাজিক অন্যায় ও বৈষম্য দূর করতে হবে। জনগণের গণতন্ত্রের মৌলিক দাবীই হচ্ছে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং বৈষম্যহীন শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা।

২। মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা : আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয় অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। অন্যায়, অনাচার ও দুর্নীতি আমাদের সমাজ জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। স্বার্থ চিন্তা এমন এক পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, সমাজের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত একটি গোষ্ঠি দেশের সম্পদকে লুটেপুটে ভোগ দখল করছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দেশপ্রেমিক, তারা দেশের কল্যাণ ও মঙ্গল চায়। দেশপ্রেমিক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সৃজনশীল উৎপাদনমূখী জীবনবোধ ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর। আমাদের সমাজের তরুণ ও যুব সমাজকে সংগঠিত করে জাতি গঠনমূলক কাজে নিয়োগের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যাতে তারা হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ ফিরিয়ে পেতে পারে। এ লক্ষ্য অর্জনে সকল সামাজিক শক্তিকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

৩। স্থিতিশীল গণতন্ত্র : সরকার কাঠামো, স্থিতিশীল গণতন্ত্রের জন্য জাতীয় ঐক্যমতের প্রয়োজন। আর এ স্থিতিশীলতা দিতে পারে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং সার্বভৌম জাতীয় সংসদের সমন্বয়ে গঠিত মিশ্রপদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা (Mixed Type of Government)। রাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়ষ্ক জনগোষ্ঠির প্রত্যক্ষ ভোটে প্রেসিডেন্ট এবং সার্বভৌম জাতীয় সংসদ নির্বাচিত হবে। জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল অথবা দলসমূহ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করবে। জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট (অথবা বিদ্যমান পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট) এবং সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় ভারসাম্য আনতে হবে। অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ অগ্রাধিকার পাবে তবে যাতে কোনো অবস্থাতেই সংসদ বা প্রধানমন্ত্রী অগণতান্ত্রিক মানসিকতা প্রদর্শন না করেন সেই জন্য রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ সাংবিধানিকভাবে রাখতে হবে। এইরূপ ভারসাম্যভিত্তিক পরিচালনায় স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এ ব্যবস্থায় উন্নয়ন, উৎপাদনের রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং

সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের রাজনীতির অবসান হবে। আমাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও জনজীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগের সকল অংগ প্রতিষ্ঠানকে পৃথক করে বিচার বিভাগের অধীনে ন্যস্ত করতে হবে। আইনের চোখে সকল নাগরিকই সমান। জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে প্রতিশ্র"তিবদ্ধ হতে হবে।

৪। রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ : উৎপাদনমূখী ও গণমূখী রাজনীতি কেন্দ্রিভূত ক্ষমতার অবসান ঘটাবে। স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা ও দক্ষতাকে ক্রমান্বয়ে এবং দ্র"ত গতি বাড়াবার জন্য কাজ করবে। স্থানীয় সরকার যেমন : ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদ, যাতে জাতীয় জীবনে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে সে জন্য ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক, সাংগঠনিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্থানীয় সরকারগুলোকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে করে সামন্তবাদের অবশেষসমূহ গ্রামীণ সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়। এ জন্য সুবিধা বঞ্চিত গ্রামের নারী-পুর"ষ, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত তর"ণ-তর"ণীকে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ণ, উন্নয়ন কর্মকা"ে সম্পৃক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামো, গণসংগঠন গড়ে তোলা হবে।

৫. সামাজিক ন্যায় বিচার ভিত্তিক মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Type of Economy) : পার্টি সামাজিক ন্যায় বিচার ভিত্তিক সুষম অর্থনৈতিক বণ্টন ব্যবস্থায় বিশ্বাস করে। জনগণ আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ শোষণের শিকার হোক-পার্টি তা চায় না। পার্টির অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় জনগণ অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বাসস্থানের মত মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা পাবে। কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের অংশ গ্রহণের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভব। পার্টি মনে করে মৌল অর্থনীতির সংগে সম্পর্কযুক্ত এবং প্রতিরক্ষামূলক শিল্প উদ্যোগ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এর বাইরে সকল শিল্প ও উৎপাদন ক্ষেত্রে সকল বাংলাদেশী বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তা এবং বৈদেশিক শিল্প উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে। তবে কোন অবস্থাতেই জাতীয় শিল্প বিকাশের অন্তরায় কোন বিদেশী উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে না। মাঝারী ও ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগ সব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। বর্তমান মুক্ত অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার কথা বিবেচনায় রেখে মিশ্র অর্থব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে। পাবলিক সেক্টর এবং প্রাইভেট সেক্টরের অসম প্রতিযোগিতা বন্ধ করা হবে। পাবলিক সেক্টরের অধীন সকল সেক্টর কর্পোরেশন বিলুপ্ত করে মিল, কল-কারখানাগুলোকে স্ব-স্ব (সংশিণ্টষ্ট) মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে। এতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আসবে বলে পার্টি মনে করে। জাতীয় স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও সুষম বণ্টনভিত্তিক জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের অন্তরায় যে কোন বিদেশি উদ্যোগকে পার্টি নির"ৎসাহিত করবে।

৬। মানব সম্পদের উন্নয়ন : বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ কর্মক্ষম মানুষ নিরক্ষরতা, কর্মদক্ষতাহীনতা এবং পর্যাপ্ত সুযোগের অভাবে বেকার জীবন যাপন করছে। এ বেকার জনগোষ্ঠিকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে কুটির শিল্প, কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় সকল রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে। বেকার জনগোষ্ঠিকে উপার্জনক্ষম ও স্বাবলম্বী নাগরিক হিসেবে পরিণত করাই লক্ষ্য। কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলবে, জনসংখ্যা সমস্যাকে মানবসম্পদে পরিণত করতে পারলে জাতীয় প্রগতি ও উন্নয়নে এক নবদিগন্তের সূচনা হবে। পার্টি জনসংখ্যা সমস্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে।

৭। নারী সমাজের উন্নয়ন : মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারী সামাজিক কুসংস্কারে আবদ্ধ ও অবর"দ্ধ। এই নারী সমাজকে জাতি গঠনমূলক ও জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকা"ে সম্পৃক্ত করতে হবে। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিধিকে আরও বাড়িয়ে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংগে সংগতি রেখে এবং স্থানীয় সরকার সহ সংশিণ্টষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ নারীসমাজকে উন্নয়নে-উৎপাদনে সম্পর্কিত করার জন্য ব্যাপক ও সার্থক প্রচেষ্টা

চালাতে হবে। রাষ্ট্রের সকল জাতীয় নির্বাচনে নারী সমাজের অংশগ্রহণকে আরো উৎসাহিত করতে পার্টি প্রচেষ্টা চালাবে। সকল পর্যায়ের নির্বাচনে নারী সমাজকে অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। নারী জাতি তাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও জাতি গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। মনে রাখতে হবে জনসংখ্যার অর্ধেকাংশ নারী সমাজকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বাইরে রেখে জাতীয় উন্নয়ন, অগ্রগতি ও প্রগতি সম্ভব নয়। তাই পার্টি নারীর সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করতে বদ্ধপরিকর।

৮। জাতি গঠনে যুব সমাজের ভূমিকা : দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুবক। এই বিপুল যুবক যুবতী তরুণ-তরুণীকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বাইরে রেখে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। জাতীয় উন্নয়নে যুব সমাজের ভূমিকা অপরিহার্য। জাতীয় উৎপাদন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুব সমাজকে কাজে লাগানোর যুগোপযোগী কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ অর্জনে পার্টি 'জাতীয় যুবনীতি' প্রণয়ন করবে। যুবনীতি আমাদের অফুরন্ত প্রাণশক্তি যুব সমাজকে যথাযথভাবে সমাজ প্রগতির কাজে সম্পৃক্ত করতে পারবে বলে মনে করে।

৯। পলণ্টী এলাকার উন্নয়ন : বাংলাদেশের পঁচানব্বই শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন। পার্টি গ্রামের জনগণের সার্বিক কল্যাণে বদ্ধপরিকর। গ্রামীণ জীবনে ক্ষুধা, দারিদ্র ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থার অবসানের জন্য পার্টি প্রচেষ্টা চালাবে। ৬৮ হাজার গ্রামের উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। কুটির শিল্প, কৃষি, মৎস্য, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং জীবন উপযোগী শিক্ষা বিস্তারে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বাংলাদেশের পলণ্টী অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য পার্টি কাজ করবে।

১০। কৃষি উন্নয়ন এবং কৃষিনীতি : গ্রামীণ জনগণের পঁচাশি শতাংশই কৃষিজীবী। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনই পার্টির লক্ষ্য। কৃষি যন্ত্রপাতি, কৃষি উপরকণ, কৃষিজীবীকে প্রশিক্ষণ ও সমর্থন দিয়ে কৃষি ও কৃষকের ভাগ্যের পরিবর্তন করা যেতে পারে। জাতীয় অর্থনীতিকে স্বনির্ভর ও বলিষ্ঠ করে গড়ে তুলতে হলে ভূমি সংস্কার ও ভূমি বণ্টনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পার্টি এ লক্ষ্য অর্জনে বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে একটি কৃষিনীতিমালা প্রণয়ন করবে।

১১। জাতীয় উন্নয়নে সমবায় : জাতীয় ভিত্তিক সমবায় আন্দোলন ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার অবসান, মধ্যস্বত্ত্বভোগী সুবিধাবাদী, দুর্নীতিবাজ টাউট শ্রেণীর উৎখাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে সমবায় আন্দোলনে সফলতা আসবে। কৃষি ও কুটির শিল্পে ব্যাপক উন্নয়নের জন্য সমবায় পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। গ্রামের কৃষক, দিনমজুর, ক্ষুদ্র দোকানদার, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী জনগগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে সুসংহত করা এবং জাতীয় উৎপাদনের বলিষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে সমবায়কে কাজ করার জন্য পার্টি সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে। এর জন্য একটি সমবায় নীতিমালা প্রণয়নে পার্টি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১২। সৃজনশীল গণতান্ত্রিক শ্রমনীতি : জাতীয় স্বার্থে শিল্প এবং শ্রমিকের সমন্বয় ও সমতা বিধান করতে হবে। শ্রমিকের ন্যায্য মজুরীর নিশ্চয়তা দিতে হবে। আই এল ও'র কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দিতে হবে। তবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে উৎপাদন-উন্নয়নের স্বার্থে পরিচালিত করতে হবে। বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির কথা বিবেচনায় রেখে নতুন শ্রমনীতি প্রণয়ন করা হবে।

১৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা : উৎপাদন ও উন্নয়নই হচ্ছে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি। পুষ্টি বর্ধন ও স্বাস্থ্য কর্মসূচীকে জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত করতে হবে। একথা সত্য যে, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম অতীতের তুলনায় জীবনমূখী ও জীবন নির্ভর হয়ে উঠছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার

পরিকল্পনার সফলতা জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফলতা এনে দিতে পারে। এ বিষয়ে পার্টি একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুসরণ করবে।

১৪। গণমূখী শিক্ষা : ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার দাবীতে এ দেশের ছাত্র সমাজ অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। পার্টি সময়ের প্রয়োজনে বাস্তবমূখী শিক্ষানীতি প্রণয়নে বিশ্বাস করে। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা তথা শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈপণ্ঢবিক পরিবর্তনে মহান শহীদানের আত্মত্যাগের কথা পার্টি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ রাখবে। পার্টি শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে।

১৫। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন : বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল রাষ্ট্র সমৃদ্ধ হতে পারবে যদি সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। অর্থনৈতিক কর্মকা"কে কাঙ্ক্ষিত লক্ষে পৌঁছাতে হলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অতীব জর"রী। জাতীয় অর্থনীতি, বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতি ও মানব সম্পদের উন্নতির জন্য রেলওয়ে, সড়ক-মহাসড়ক, বিমান ও নৌ-পরিবহন সকল ক্ষেত্রে যোগাযোগ এবং পরিবহন ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতিসাধন করতে হবে। জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষে পার্টি গ্রহণযোগ্য টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

১৬। প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার : মাটি এবং পানির নিচে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অনাবিষ্কৃত আছে। ইতোমধ্যে দেশী-বিদেশী তৈল ও গ্যাস আহরণ কোম্পানীগুলো তৈল ও গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে কয়লা ও স্বর্ণের মত প্রাকৃতিক সম্পদ আজও অনাবিষ্কৃত। প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং উন্নয়নের মাধ্যমে জাতিকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে পার্টি যথার্থ ভূমিকা পালন করবে। পাথর, তৈল, কয়লা, গ্যাস, চীনামাটি, পানি সম্পদ, সৌরতাপ, স্বর্ণ, বনজ ও পশুজাত দ্রব্যাদি দেশ ও জাতির প্রয়োজনে পার্টি আধুনিক বাস্তবমুখী উন্নয়ন ও ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন করবে এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধশালী জাতিতে পরিণত করবে।

১৭। আদিবাসী ও পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন : পার্বত্য অঞ্চল বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সামিল হতে পারেনি। যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে এসব অঞ্চলের জনগণ অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও পশ্চাতপদ। পার্টিকে সকল অঞ্চলের নাগরিকের সমানাধিকারকে নিশ্চিত করতে হবে। যে সকল আদিবাসী ও দুর্গম পাবর্ত্য অঞ্চলের উপজাতি ঔপনিবেশিক কারণে শিক্ষাসহ নানা ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছেন তাদের দ্র"ত ও অর্থবহ উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য পার্টিকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রাষ্ট্রের সকল অঞ্চলে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।

১৮। পানি সম্পদের উন্নয়ন : পানি সম্পদের উন্নয়নের জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ, গঙ্গা নদীসহ সকল অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্সা আদায়ে পার্টি দ্বি-পক্ষীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সকল ফোরামে আপোষহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

১৯। সশস্ত্রবাহিনী প্রসঙ্গে : জাতীয় স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখ"তা রক্ষাই হচ্ছে সশস্ত্রবাহিনীর কাজ। সশস্ত্র বাহিনী আমাদের জাতীয় অহংকার এবং দেশের অতন্দ্র প্রহরী। আমাদের সশস্ত্রবাহিনী ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের সময় রণাঙ্গনে গঠিত হয়েছে। স্বাধীন দেশের সশস্ত্র বাহিনী যাতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সমরোপকরণ শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সে জন্য পার্টি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। বহিঃশক্তির আক্রমণ মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সব আধুনিক সমরাস্ত্র মওজুদ করা হবে। জাতি গঠনমূলক কাজে সম্ভাব্য

সব ক্ষেত্রে সশস্ত্রবাহিনীকে সম্পৃক্ত করা হবে। সশস্ত্র বাহিনীর পেশাগত দক্ষতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার সংগে সংগে সক্ষম সকল নাগরিককে সামরিক ট্রেনিং প্রদান করা হবে। সশস্ত্রবাহিনী আমাদের সমাজেরই অংশ। তাই ন্যায়সংগত সকল সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানে পার্টি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২০। মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে : ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের বীর সেনানীরা আমাদের জাতীয় উপলব্ধি এবং সংহতির প্রতীক। মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা যাতে জাতি গঠনমূলক কর্মকাে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে সে জন্য পার্টি প্রয়োজনীয় সকল কর্মসূচী গ্রহণ করবে। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট এর সকল অঙ্গ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হবে। তবে এ প্রতিষ্ঠানকে বর্তমান সকল বির্তকের উর্দ্ধে রাখার ব্যবস্থা নেয়া হবে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানের সাথে সমাজ ও জাতীয় জীবনে বিচরণ করার জন্য রাষ্ট্র সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বর্তমানে প্রচলিত সকল অসম্মানজনক ব্যবস্থাদি বাতিল করা হবে। মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের জাতীয় গৌরব। ১৯৭১ সনের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল স্মৃতিকে অবিশ্বরণীয় করে রাখা হবে। গৌরব গাঁথা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক দলিল ও প্রামাণ্য ইতিহাস জাতীয় পর্যায়ে সংরক্ষণ করা হবে এবং ভবিষ্যত বংশধরদের অনুপ্রাণিত করার জন্য সকল ব্যবস্থা নেয়া হবে। একইসংগে পার্টি ১৯৭১ সনে স্বাধীনতার বির"দ্ধে অস্ত্রধারী ক্যাডারদের একটি তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা হবে।

২১। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে : আমাদের জাতীয় পরিচয়ের ও আত্মপোলব্ধির অনস্বীকার্য উপাদান হচ্ছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। ১৯৪৮-৫২ এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, আমাদের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন, স্বাধীকার আন্দোলন এবং স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রথম মৌলিক সোপান। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যাতে জাতীয় জীবনে পূর্ণ ও যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় সে জন্যে পার্টি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার ও ব্যাপকতার প্রসারের জন্য পার্টি সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সকল বিদেশি গবেষণামূলক গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতিলাভ আমাদের কালের এক ঐতিহাসিক ঘটনা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের স্বার্থে ইংরেজীসহ প্রয়োজনীয় সকল বিদেশি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যাতে করে দেশ-বিদেশে আমাদের জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য অধিকতর মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

২২। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পর্কে : সৃজনশীল প্রতিভার সুষ্ঠু বিকাশের স্বার্থে পার্টি ক্রীড়া ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। দেশের সকল উন্নত ও অনুন্নত এলাকায় উপযুক্ত সংখ্যক ক্রীড়া ও সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার জন্য সকল বিজাতীয় অপসংস্কৃতিকে র"খে দিয়ে জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে। একটি সুখী সমৃদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য সাংস্কৃতিক বিপণ্ঢব (পরিবর্তন) অপরিহার্য। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি জাতীয় সাংস্কৃতিক নীতি প্রণয়ন করা হবে। জীবন নির্ভর সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পাশাপাশি উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্রীড়াঙ্গনে বৈপণ্ঢবিক পরিবর্তন আনতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন একটি ক্রীড়ানীতি। পার্টি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

২৩। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি : বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃত। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করেন। ধর্মীয় সম্প্রীতি আমাদের ঐতিহ্য। ইসলাম মানবতার ধর্ম, ইসলাম ধর্মের অনুশাসন এবং ইসলাম ধর্মের শিক্ষা আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অনুসরণ করতে হবে। ইসলাম ধর্মই একমাত্র ধর্ম যে ধর্ম অন্যান্য ধর্মালম্বীর ধর্মীয় অধিকারকে স্বীকার করে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত

করে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই দেশে কখনও কখনও কায়েমী স্বার্থবাদীরা উস্কানী দিয়ে সম্প্রীতি বিনষ্টের অপচেষ্টা চালাতে পারে সেদিকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। দেশে-বিদেশে মহল বিশেষ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্প ছড়াতে চেষ্টা অতীতে যেমন করেছে ভবিষ্যতেও করবে। এ ব্যাপারে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সক্রিয় করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পার্টি উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট সমূহকে আরো সক্রিয় ও গতিশীল করতে হবে। উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদকে নির"ৎসাহিত করা হবে এবং সকল ধর্মীয় সংগঠনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্টপোষকতা করা হবে। সকল ধর্মের অনগ্রসর মানুষকে উপযুক্ত ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হবে। সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে শাণিত করতে হবে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। দেশপ্রেমিক জনগণের ধর্মীয় মূল্যবোধ আমাদের সমাজ জীবনকে কলুষমুক্ত করবে। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশকে সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য মডেল হিসেবে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পার্টি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২৪। পালনবাদ তথা মানবতাবাদ সম্পর্কে : পালনবাদ সম্পর্কে পার্টি জনগণকে সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করবে। পালনবাদ (রবুবিয়াত) তথা মানবতাবাদ হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মুক্তির একমাত্র পথ। যে সমাজে ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের কোন ভেদাভেদ থাকবেনা সে সমাজ হচ্ছে পালনবাদ তথা মানবতাবাদের সমাজ। আমাদের পথপ্রদর্শক মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর আজীবনের লালিত স্বপ্ন পালনবাদ (রবুবিয়াত)। পার্টি মওলানা ভাসানীর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করবে। পালনবাদ সম্পর্কে মওলানা ভাসানী বলেন-ইসলামের কলেমার ভিতরে নিহিত রয়েছে ইসলামী বিপণ্ঢবের মুলমন্ত্র। আলণ্ঢাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, সুতরাং সব কিছুর উপর আলণ্ঢাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করেছে কলেমার শাশ্বত বাণী। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্ত সম্পদের মালিকানা-আলণ্ঢাহর উপর ন্যস্ত করে ইসলামী বিপণ্ঢব সর্বপ্রকার শোষণের অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। অর্থ এবং সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করেছিল ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা। সাম্য এবং ভ্রাতিত্বই হচ্ছে ইসলামের পালনবাদ। ইসলামে পালনবাদের মূল কথা হল স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং স্রষ্টাকে লালন-পালন এবং বিবর্তনকর্তা হিসেবে স্বীকার করা। সারা বিশ্ব ব্রহ্মাে"র সব কিছুকে স্রষ্টা যেমন লালন-পালন করেন। তেমনি স্রষ্টা লালন-পালন করেন সৃষ্টির অভিজাত মানুষকেও। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে। তাই মানুষ পালনবাদের নীতিকে প্রবর্তন করবে, শাসনবাদকে পরিহার করবে। মানবতাবাদী সমাজে মানুষকে শাসন করা হয়না, সেবা করা হয়। সমাজ জীবনে শোষকেরা তাদের পথকে ভ্রান্ত বলে উপলব্ধি করবে এবং নিজেদের শুধরিয়ে নেবে। পালনবাদী পন্থায় শোষণ রোধ করা যাবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রেমপ্রীতি ভালবাসা সঞ্চিত হবে। ইসলামে যে শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে তাহলো, শোষকের বির"দ্ধে শোষিতের সংগ্রাম। সারা বিশ্বকে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য পালনবাদের পথ অনুসরণ করতে হবে। তবেই শান্তিময় বিশ্ব গড়ে উঠবে।

২৫। পররাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : আত্মনির্ভরশীল জাতিই কেবল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সম্মান ও মর্যাদার আসনে সমাসীন হতে পারে। বাংলাদেশকে আর্ন্তজাতিক অংগনে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে সম্মান ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পার্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে অন্যান্য স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংগে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে। কারো সংগে শত্র"তা নয়, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হবে পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের জনগণ দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের যেমন বিরোধী তেমনি দেশের অভ্যন্তরেও দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাংলাদেশ হস্তক্ষেপ করার নীতিতে বিশ্বাস করেনা এবং বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোন রাষ্ট্র ও সংস্থার হস্তক্ষেপও কাম্য নয়। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সনদ ও মূলনীতি বাংলাদেশ অনুসরণ করবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থায়ী করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অবদান রাখবে। গণচীনসহ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ এবং মুসলিম বিশ্বের সংগে সম্পর্ক স্থায়ী ও দৃঢ় করা, আরব ও ফিলিস্তিনী জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায়

সমর্থন দান, জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের সংগে মৈত্রীর সম্পর্ক জোরদার করা, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের ন্যায়সংগত সংগ্রামকে সমর্থন দেয়া হচ্ছে পার্টির পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে নিরঙ্কুশ ও সুদৃঢ় করার জন্য সকল দেশের সংগে এমন সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে যাতে করে আমাদের উন্নয়ন, উৎপাদন ও সমৃদ্ধির শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করবে। কারো আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার নীতিতে বিশ্বাস করেনা এবং কেউ বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কর"ক, সেটা কোন ভাবেই সহ্য করা হবেনা। আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য মহল বিশেষ তৎপর, তাদের ব্যাপারে সরকারকে সাবধান, জনগণকে সতর্ক করার পক্ষে পার্টি যথাযথ ভূমিকা পালন করবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে মৌলবাদী ও অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করার যে কোন অপচেষ্টাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করা হবে। রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত র"খে দিয়ে জাতীয় নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক জোরদার ও শক্তিশালী করার জন্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশিণ্টষ্ট সকল কর্মকা"কে গতিশীল করা হবে। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী মর্যাদাস্পূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে এবং জনগণের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সমন্বয়ে পার্টি বাস্তব ও সময়োপযোগী পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করবে।